FORB Learning Platform

স্ক্রিপ্ট: ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ

টিভিতে খবর দেখে বা আপনার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো আপনি জেনে থাকবেন যে, অনেক সরকারই ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার উপরে নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করে থাকে। তাদের যুক্তি হচ্ছে কোনো না কোনো কারণে ধর্মচর্চার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিণ করতে হয়। এই নিয়ন্ত্রণ আদৌ ন্যায্য এবং গ্রহণযোগ্য কিনা তা আমরা কীভাবে বুঝব?

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ, বেছে নেওয়া, পরিবর্তন বা ত্যাগের অধিকার নিরঙ্কুশ অধিকার– এই অধিকারের উপর কখনোই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না। অন্যদিকে, ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের অধিকারকে কেবলমাত্র চারটি শর্ত বা নিয়মের আওতায় নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

১. যে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় আরোপ করতে হবে।
এর উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্র, পুলিশ এবং আদালত কর্তৃক অপ্রত্যাশিত ও অযৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ বন্ধ করা।
২. এই নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য বা নৈতিকতা অথবা অন্যদের স্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষায় আরোপ করার প্রয়োজন হতে পারে।
এটি গুরুত্বপূর্ণ। ভোট পাওয়ার প্রত্যাশায় নিয়ন্ত্রণ আরোপের তুলনায় অন্যকে সুরক্ষা দানের জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।
৩. নিয়ন্ত্রণ আরোপ বৈষম্যমূলক হতে পারবে না।
৪. যে কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ অবশ্যই ধর্মীয় প্রকাশজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যার মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

এই শর্ত/ বা নিয়মগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো না থাকলে সরকারের পছন্দের নয় এমন যে কোনো গোষ্ঠী বা তাদের চর্চার উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম হবে। নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সর্বশেষ পন্থা, এটি রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো হাতিয়ার নয়।

আসুন একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে দেখা যাক, এই নিয়মগুলোর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝানো হয়েছে।

মনে করুন, কোনো একটি শহরে পাঁচটি পৃথক ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে। তাদের প্রত্যেকেরই উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চ আওয়াজ হয়ে থাকে যা প্রতিবেশীরা পছন্দ করেন না! কিন্তু পুলিশ কেবল একটি ছোট, অ-জনপ্রিয় গোষ্ঠীর ব্যাপারে অভিযোগ পেল...

উচ্চ মাত্রার শব্দ স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য জনস্বাস্থ্য একটি ন্যায্য কারণ হতে পারে। কাজেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এখন কী করা উচিত? জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এখন কী ধরনের প্রযোজনীয়, বৈষম্যহীন ও সমস্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে?

এক্ষেত্রে যে কোনো জনসমাগমে শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সাধারণ আইন উপযুক্ত হবে। একটা আইন যা সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় ও অন্যদের সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। কোনো গোষ্ঠী যদি নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি শব্দ ব্যবহার করে তাহলে তাদেরকে শব্দের মাত্রা কমাতে নির্দেশ দেওয়া বা জরিমানা করা ন্যায্য হবে। তাদেরকে একদম নীরব হতে বলা বা যেকোনো ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা মোটেও যথোপযুক্ত হবে না!

পুলিশকেও সবার প্রতি সমানভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে, যদিও তারা মাত্র একটি অ-জনপ্রিয় দলের ব্যাপারে অভিযোগ পেয়েছে।

এটি খুবই সাধারণ ও ছোট একটি উদাহরণ।

যখন আমরা ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার বড় ধরনের লংঘনের দিকে দৃষ্টি দেই , তখন আমরা সহজে বুঝতে পারি এই নিয়মগুলোকে কীভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে, কারণ যেসকল নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে সেগুলো স্পষ্টভাবেই অপ্রয়োজনীয়, বৈষম্যমূলক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনেক দেশে ধর্মীয় কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নিবন্ধিত ভবনের বাইরে যে কোনো ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে আপনার ঘরে অতিথিদের সাথে বসে খাবার খাওয়ার আগে ছোট করে ধন্যবাদের প্রার্থনা করাটাও বেআইনী! এধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ মোটেও বৈধ নয়!

তবে বিতর্কিত অনেক ঘটনা আছে। মুখমন্ডল এবং পায়ের পাতা বাদে বাকি শরীরটুকু আবৃত রাখে এমন একটি সাঁতারের পোশাক হচ্ছে বারকিনি – সেটাকে নিষিদ্ধ করা ফ্রান্সের সেই মেয়রের জন্য কি ঠিক হয়েছে? অথবা ভারতের কিছু অঞ্চলে নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অন্যের কাছে বলার অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ কি আদৌ যুক্তিযুক্ত?

এই উপস্থাপনায় আমরা সাতটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যা কোনো নিয়ন্ত্রণের বৈধতা নিরূপণের জন্য প্রতিটি আদালতের বিবেচনা করা উচিত। আপনি যেসকল নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন সেগুলোকেও বিশ্লেষণ করতে এই সাতটি প্রশ্ন সহায়তা করবে বলে আশা করি।

একটি রাষ্ট্র যখন কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে, তখন প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত এই বিধি নিষেধের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ বা গ্রহণের নিরঙ্কুশ অধিকার বা ধর্মীয় আচরণ প্রকাশের অধিকার কোনটিকে খর্ব করা হয়েছে?

নিরঙ্কুশ অধিকারকে যদি খর্ব করা হয় তাহলে রাষ্ট্রের পদক্ষেপ বৈধ নয়। কিন্তু যদি আচরণ প্রকাশের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় তাহলে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাব।

যে আচরণটির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে সেটি কি ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রকাশ, নাকি কেবলই একটি সাধারণ আচরণ?

আমরা যে কাজগুলো করে থাকি তা অনেক সময় আমাদের বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে আমাদের সব কাজই ধর্ম বা বিশ্বাসের সুরক্ষিত প্রকাশভঙ্গি নয়। কেউ যখন অভিযোগ করে যে, তার প্রকাশের অধিকার খর্ব করা হয়েছে, তখন আদালত বিবেচনা করে যে, তার আচরণ ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা। আচরণ ও বিশ্বাসের সংযোগ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদালত দেখার চেষ্টা করে যে, তাদের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে কিনা।

অনেক সময় ব্যাপারটি বেশ সহজ। গীর্জায় যাওয়া খ্রীষ্টধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং রোজা রাখা ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

কিন্তু সব সময় এত সহজ নয়। যেমন, কোনো একজন খ্রিষ্টানের কাছে ক্রুশ পরাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না; কিন্তু আরেকজন খিস্টানের কাছে তা ধর্মীয় পরিচয়ের এক গভীর অভিব্যক্তি। এবং মুসলিম নারীদের হিজাব নিয়ে ভিন্ন ধরনের বিশ্বাস রয়েছে।

কোন বিশ্বাসটি সঠিক সেটা নির্ধারণ করা আদালতের কাজ নয়। কোনটি ধর্মীয় আচরণের প্রকাশ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আদালতকে কোনো একটি ধর্মীয় মতবাদের তুলনায় অন্য একটি মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে। মানবাধিকার ব্যক্তি বিশেষের অধিকার, তাই প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদের পরিবর্তে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাসকে খতিয়ে দেখে। কেননা, যদি সংশ্লিট ব্যক্তি কোনো একটি কাজকে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকাশ বলে বিবেচনা করে থাকে, তবে তার জন্য সেটাই ঠিক।

যখন আমরা নিশ্চিত হব যে, কোনো সুরক্ষিত আচরণের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, তখন আমাদের দেখতে হবে এই নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় আরোপ করা হয়েছে কিনা।

এই নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য কি কোনো লিখিত আইন, নজির বা প্রথাগত আইন রয়েছে? অথবা কোনো আইনগত ভিত্তি ছাড়াই কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপ করা হয়েছে? যদি কোনো আইনি ভিত্তি না থাকে, তাহলে এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ বৈধ নয়।

পরবর্তী ধাপ হচ্ছে এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ কোনো বৈধ কারণকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন কিনা তা বিশ্লেষণ করে দেখা। এই উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের প্রথমে দেখতে হবে, যে আচরণ বা চর্চা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তার সাথে কোনো বৈধ কারণের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে কিনা এবং দ্বিতীয়ত দেখতে হবে এই নিয়ন্ত্রণ আরোপের আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কিনা। প্রতিটি প্রশ্নই একে একে আলোচনা করা যাক।

আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র বৈধ কারণ হচ্ছে জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য বা নৈতিকতা এবং অন্যদের স্বাধীনতা ও অধিকারের সুরক্ষা।

সুতরাং যে আচরণটি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে সেটি কি এই কারণগুলোর একটিকেও ঝুঁকিগ্রস্ত করে তুলছে? এবং এর কি কোনো প্রমাণ আছে?

রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত আচরণগুলোর সাথে অন্তত একটি বৈধ কারণের **প্রত্যক্ষ সংযোগ** দেখাতে হবে।

হিন্দু বর্ণপ্রথায় মানুষকে উচ্চ ও নিম্ন বর্ণ এবং বর্ণহীন দলে ভাগ করা হয়েছে। বর্ণহীন মানুষেদেরকে চরম বৈষম্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। কোনো কোনো মন্দিরে বর্ণহীন হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ভারতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ণপ্রথা বা শ্রেণিভেদ বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং মন্দিরগুলো এখন আর বর্ণহীন হিন্দুদের প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে না। এই নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে – এখানে শ্রেণিবৈষম্য প্রতিরোধ এবং অন্যদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার মধ্যে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে।

কিন্তু সকল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এতটা স্পষ্ট সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না এবং মাঝে মাঝে সরকার বৈধ কারণগুলোকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে বা অপব্যবহার করে।

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রতি নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় **জনশৃঙ্খলার** সাথে সম্পর্কিত থাকে। জনশৃঙ্খলা আইন অনেক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন হুমকি, হামলা, সহিংসতার প্ররোচণা এবং কখনো কখনো ধর্মনিন্দা।

ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে মূলত আপনি যা সত্যি বলে বিশ্বাস করেন তা বলার অধিকারকে বুঝায়। বিশ্বাস শান্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় আবার সহিংসতার উদ্রেগকারী/ উস্কানিমূলক ভাবেও প্রকাশ করা যায়। দুঃখজনক হচ্ছে, কোনো কোনো মানুষ নিজের ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া অন্য কারও বিশ্বাসের শান্তিপূর্ণ প্রকাশে এতটাই বিক্ষুদ্ধ হয় যে, সহিংসতার মাধ্যমে সে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে।

কোনো কোনো রাষ্ট্র বিশেষ কিছু বিশ্বাসের শান্তিপূর্ণ প্রকাশকেও নিষিদ্ধ করে থাকে এবং দাঙ্গা সংঘাত সৃষ্টির ঝুঁকিজনিত জননিরাপত্তার ইস্যুকে কারণ হিসেবে দাঁড় করায়। এই যুক্তিতে ইন্দোনেশিয়ায় প্রকাশ্যে আহমদিয়া বা নিরীশ্বরবাদী বিশ্বাসের প্রকাশকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে সহিংসতার শিকার মানুষদেরকে অনেক সময় ধর্মনিন্দা বা সহিংসতার উদ্রেককারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয় না।

এ ধরনের আইন কখনো সহিংসতা হ্রাস করতে পারে না। বরং তা এই ধারণাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করে যে, যারা 'ভুল' বিশ্বাস ধারণ করে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

আরেকটি বিতর্কিত বিষয় হচ্ছে **জননৈতিকতা**। সবাই কি একই নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে এবং কার নৈতিক আদর্শ সর্বসাধারণের জন্য অনুসরণীয়? জাতিসংঘ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞগণের মতে, জননৈতিকতার সংজ্ঞা আসা উচিত "বহু সামাজিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রথা" থেকে। অন্যভাবে বললে, আপনি শুধুমাত্র সংখ্যাগুরুর নৈতিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন না।

আপনি জেনে অবাক হবেন যে, **জাতীয় নিরাপত্তা** কখনোই ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত ভিত্তি নয়।

অনেক সরকার কোনো কোনো গোষ্ঠীকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে থাকে, বিশেষ করে যদি সেই গোষ্ঠী কোনো শত্রু দেশে প্রবর্তিত হওয়া ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করে থাকে। সনদ রচয়িতারা একমত হয়েছেন যে, জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে থাকে এবং এতে জাতীয় নিরাপত্তা যোগ করলে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সে সময় তাকে অপ্রয়োগযোগ্য করে তোলে।

সুতরাং আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে, বিশ্বাসের চর্চা কীভাবে কোনো বৈধ কারণকে হুমকির মুখে ফেলেছে তার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সংযোগ রাষ্ট্রকে দেখাতে হবে। আমরা আরও দেখলাম, বৈধ কারণগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ।

এবার আমরা প্রশ্নের পরের অংশে যাই – নিয়ন্ত্রণ কি আদৌ প্রয়োজনীয়? রাজনৈতিক বা সংখ্যাগুরু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যাশিত এমনটি নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়।

ধরা যাক, সরকার দেখালো যে, তাদের প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণের সাথে অন্যের স্বাধীনতা ও অধিকার সুরক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে।

এই হুমকি কি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার মত যথেষ্ট গুরুতর?
অন্যদের অধিকার সুরক্ষায় কি এই প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে?
অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে অন্য কোনো উপায়ে কি এই সমস্যার সমাধান করা যায়?

সমস্যা যদি গুরুতর না হয়, যদি প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সমাধানে খুব একটা ভূমিকা না রাখে অথবা যদি নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো উপায় থাকে, তাহলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ প্রয়োজনীয় নয়।

চীন সরকার দাবী করে যে, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে জনসংখ্যার বাহুল্যের কারণে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কা বিরাজ করছে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা হচ্ছে বৈধ ভিত্তি। এর একটি সমাধান হতে পারে কেন্দ্রগুলোকে সংস্কার ও প্রসারিত করা। এই সমাধানের ফলে কোনো অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু পরিবর্তে, সরকার পুরো স্থাপনা ধ্বংস করেছে এবং জোরপূর্বক ১০০০ ভিক্ষুকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করেছে যার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

কোনো কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। জাতিসংঘ স্পষ্টভাবে বলেছে যে, ক্ষতিকর প্রথাগত চর্চা অবশ্যই নিষিদ্ধ করা উচিত, যেমন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণের সময়কালীন কিছু রীতিনীতি এবং নারীদের লিঙ্গছেদন।

অনেক ক্ষেত্রেই মূল ঘটনাটি পরিষ্কার থাকেনা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা প্রমাণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরেই বর্তায়।

যখন আমরা নিশ্চিত হব যে, নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য রাষ্ট্রের বৈধ কারণ রয়েছে এবং তা প্রয়োজনও বটে, তখন আমাদের যাচাই করতে হবে এই নিয়ন্ত্রণ বৈষম্যমূলক কিনা।

আপনার মনে হতে পারে আইন, নীতি বা চর্চা বৈষম্যমূলক কিনা সেটা যাচাই করা সহজ কাজ। হ্যাঁ, যদি সেটা সকলের জন্য না হয়ে কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হয় তাহলে তা অবশ্যই বৈষম্যমূলক। একে বলা হয় প্রত্যক্ষ বৈষম্য এবং তা একেবারেই নিষিদ্ধ।

কিন্তু কোনো কোনো সময় সবার প্রতি যে আইন সমানভাবে প্রযোজ্য সেটা কোনো কোনো গোষ্ঠীর উপর বেশি প্রভাব ফেলে এবং অন্যান্যদের উপরে কোনো প্রভাবই ফেলে না। একে বলা হয় পরোক্ষ বৈষম্য।

আমাদের সেই কাল্পনিক শহরে চলুন আরেকবার ফিরে যাই, যেখানকার ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে উচ্চ আওয়াজ হয়ে থাকে। শহরের কাউন্সিল জনসমাগমে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ে শব্দের মাত্রার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে আইন প্রবর্তন করেছে। এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো সবাই সে অনুসারে তাদের স্পীকারের ভলিউম কমিয়ে নিয়েছে। কিন্তু গীর্জার ঘন্টার শব্দ অনেক বেশি জোরালো এবং এর শব্দ কমানো যায় না। নতুন এই আইনের ফলে গীর্জার বহুদিনের প্রথাগত নিয়ম বর্জন করতে হয়েছে, কিন্তু অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এই নিষেধাজ্ঞার কারণে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি।

এটি হচ্ছে পরোক্ষ বৈষম্য।

সাধারণ আইনের ফলে পরোক্ষ বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে:

অনেক দেশে জনসাধারণের মধ্যে ছুরি বা ধারালো অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ। শিখ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর এই নিয়ম খুব একটা প্রভাব সৃষ্টি করে না। শিখ পুরুষদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে 'কারপান' নামের এক ধরনের ছুরি জামার নিচে বহন করতে হয়। কাজেই আইনটি এখানে শিখ পুরুষদের তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালনের সামর্থ্যকে সীমিত করে দিচ্ছে।

কোনো কোনো দেশের পরিকল্পনা প্রবিধান অনুসারে নতুন কোনো ভবন নির্মাণ করতে হলে প্রতিবেশী ভবন মালিকদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রতিবেশীদের পক্ষপাতিত্বপূর্ণ মনোভাবের কারণে প্রথাগত সম্প্রদায়গুলোর তুলনায় ছোট ও অ-প্রথাগত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর জন্য অনুমতি পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

নীতি ও এর চর্চা অনেক সময় সমস্যা তৈরি করতে পারে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি শনিবারে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করে, তাহলে এ্যাডভেন্টিস্ট এবং প্রথাগত ইহুদী ধর্মাবলম্বীরা বঞ্চিত হয়। প্রায়শই সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী কর্মীদেরকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসবের সময় ছুটি নেওয়ার পরিবর্তে সংখ্যাগুরু ধর্মীয় উৎসবের সাথে মিলিয়ে ছুটি নিতে হয়।

প্রত্যক্ষ বৈষম্য সব সময়ই নিষিদ্ধ। কিন্তু আদালতের উচিত পরোক্ষ বৈষম্যকেও বাস্তব একটি সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে যখনই যৌক্তিক উপায়ে সম্ভব তা নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া। অনেক সময় এ ধরনের সমস্যার খুব সহজ সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। আমাদের কাল্পনিক শহরের কাউন্সিল ব্যতিক্রম হিসেবে রবিবারে ও ধর্মীয় উৎসবের দিনে গীর্জার ঘন্টা বাজানোর বিশেষ অনুমতি দিতে পারেন।

সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা এর আগে শুধুমাত্র শনিবারে অনুষ্ঠিত হত। এখন তা শুক্রবারেও হয়ে থাকে। কর্মক্ষেত্রের ইউনিফর্মে পাগড়ির মত বিশেষ পোশাক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কিন্তু আদালতের ভাষ্য হচ্ছে, এমনটা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। পরোক্ষ বৈষম্য আইনসম্মত হতে পারে, যদি প্রমাণ করা সম্ভব হয় এর পেছনে যথেষ্ট ভাল ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি আছে।

উদাহরণস্বরূপ, হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে কর্মীরা কোনো ধরনের অলঙ্কার পরতে পারেন না, যা কোনো কোনো গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে থাকে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এই নিয়মটি যুক্তিযুক্ত নিষেধাজ্ঞা।

জনস্বাস্থ্য অবশ্যই ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি বৈধ কারণ। কিন্তু পরোক্ষ বৈষম্যের ক্ষেত্রে আদালত অন্যান্য কারণও বিবেচনা করে। যেমন, একটি কোম্পানী যুক্তি দেখাতে পারে যে, তাদের নীতির পরিবর্তন করা হলে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। কোনো পোশাকের দোকানে যদি নিয়ম হয় যে, তাদের বিক্রয়কর্মীদের অবশ্যই দোকানের নিজস্ব পোশাক পরতে হবে, সেক্ষেত্রে কোনো কর্মী যদি তার ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে সেই নিয়মটি প্রত্যাখান করে তবে তাকে নিয়োগ করার বাধ্যবাধকতা কোম্পানীর থাকবেনা।

কাজেই যখন প্রত্যক্ষ বৈষম্য নিষিদ্ধ, কোনো ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পরোক্ষ বৈষম্যকেও যতটা সম্ভব যুক্তিযুক্ত উপায়ে পরিহার করার কথা বুঝায়।

আরোপিত নিয়ন্ত্রণ বৈষম্যমূলক নয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা।

কোন মাত্রায় এই আচরণের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে? কার জন্য, কখন, কোথায় এবং কী নিষিদ্ধ করা উচিত?

বিশেষ কোনো কর্মক্ষেত্রে বিশেষ পেশায় নিয়োজিত কর্মীকে বিশেষ ধরনের ধর্মীয় পোশাক পরার অনুমতি না দেওয়ার সাথে রাস্তায় প্রকাশ্যে যে কোনো মানুষকে তার ধর্মীয় পোশাক পরতে না দেওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে!

কাজেই আন্তর্জাতিক আদালতগুলো সামঞ্জস্যতার দিকটিকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে। যুক্তরাষ্ট্রের আদালত আরও কঠোরভাবে এটার প্রয়োগ করে – যতটা সম্ভব ন্যূনতম নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে হবে।

একটি চূড়ান্ত দিক হচ্ছে, কিছু কিছু আদালত যে বিষয়টি বিবেচনা করে তা হল রাষ্ট্রীয় মূল্যায়নের সুযোগ(margin of appreciation)। এই বিশ্ব অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং মানবাধিকারের নীতি রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতি রেখে নানা উপায়ে বাস্তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এ কারণে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক আদালত 'রাষ্ট্রীয় মূল্যায়নের সুযোগ' প্রয়োগ করে থাকে। মূলত এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট সবচেয়ে ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক আদালত রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট মাত্রায় স্বাধীনতা দিয়ে থাকে।

রাষ্ট্রের বিচক্ষণতার পরিধি কতটুকু বিস্তৃত হবে এবং আদালত আদৌ এমন বিস্তৃত এখতিয়ার দেয় কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট বিতর্ক আছে!

সার কথা হচ্ছে,

কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা অনুমোদনযোগ্য কিনা, তা বিবেচনা করার জন্য আমরা নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করব –

১. আইনের মাধ্যমে আপনার ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ বা পরিবর্তনের নিরঙ্কুশ অধিকার অথবা প্রকাশের অধিকার কোনটিকে সীমিত করা হয়েছে সে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
২. যে আচরণের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে সেটিকে সুরক্ষিত ধর্মচর্চার প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।
৩. আরোপিত নিয়ন্ত্রণের কোন আইনানুগ ভিত্তি আছে কিনা তা যাচাই করা।
৪. এই আচরণ বা ধর্মচর্চা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার কোনো বৈধ কারণের জন্য যথেষ্ট হুমকিদায়ক কিনা, অর্থাৎ তা অন্য কারও অধিকার বা স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করছে কিনা তা বিবেচনা করা।
৫. এই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈষম্যমূলক কিনা তা যাচাই করা।

৬. এবং আরোপিত নিয়ন্ত্রণ হুমকির তুলনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং এর মধ্য দিয়ে সমস্যার কার্যকর সমাধান পাওয়া যাবে কিনা তা বিবেচনা করা।

মানবাধিকারের সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য আদালত যে সকল যুক্তি ও কার্যকারণ ব্যবহার করে থাকে সেগুলো যখন আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারব তখন আমরা আরও কার্যকরভাবে আমাদের অধিকার দাবী করতে পারব। এছাড়া আদালত ও সরকার এই বিষয়ে সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা বা তারা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে লংঘন করছে কিনা সে সম্পর্কিত বিতর্কেও আমরা পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারব।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত এসএমসি ২০১৮